International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Volume-III, Issue-III, April 2017, Page No. 58-66
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

পীর ফকির : সংজ্ঞা, স্বরূপ ও পরিচয়

সামস উদ্দিন বড়ভূইয়া
সহকারী অধ্যাপক, পাথারকান্দি কলেজ, করিমগঞ্জ, আসাম
Research Scholar, Dept. of Bengali, Assam University, Silchar, Assam, India

Abstract

Since long many years all community people of our region including Bangladesh also the influence of Pir-Fakir is very effective. All the people have much more concept upon the activity of such Godly man, who is popularly called as Pir-Fakir. Such people even blindly believe that the wishes of Pir-Fakir is very essential for prosper of general mass.

The word 'Pir-Fakir' is derived from the combination of two words i.e. 'Pir' and 'Fakir' means who achieved the nearness to the God through the way of meditation. Etymologically, the word 'Pir' implies, the man who has the knowledge of God and such knowledge he attained through meditation or other religious activities etc.

While, the word Fakir has a different meaning, yet both of the works of man have their same end. The means adopted by the fakir is varied from that of Pir. Etymologically, the word Fakir implies that the man who try to reach himself nearness of God and live the life of a beggar as a habit.

So it is conceived that, the man who has achieved the nearness to God through Myariphat and not Sariyah. Hence, the concept of Pir and Fakir is much popular in general people's mundane world.

পীর-ফকির, এই শব্দবন্ধটি বরাক উপত্যকার জনমানসে খুবই পরিচিত। শব্দবন্ধটি মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হলেও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষও এর সঙ্গে সমান পরিচিত। ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আদের এই উপত্যকায়ও ইসলামের বার্তাবাহক হিসাবে পীর-ফকিরদের আগমন ঘটতে শুরু করেছিল। এরপর হজরত শাহজালাল এর পদার্পণ অবিভক্ত সুরমা উপত্যকাকে পীর-ফকিরদের বন্যায় ভাসিয়ে দিয়েছিল। শাহজালালের সহচর ৩৬০ জন আউলিয়া সিলেট শহর সহ সুরমা উপত্যকার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিলেন। আমাদের বকার উপত্যকাও যেহেতু ছিল সুরমা উপত্যকার অংশ বিশেষ, সেই হিসাবে বরাক উপত্যকার ভাগ্যেও তাঁদের (আউলিয়াদের) কয়েকজনকে জুটেছিল। এছাড়া এখানকার মাটিতেও অনেকজন মহাত্মা পুরুষের জন্ম হয়েছিল, যাঁরা জনমানসের বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ধর্মীয় ভাবধারার মধ্যে থেকেও, একটু ব্যতিক্রমী জীবনযাপনে অভ্যস্থ এইসব মহাপুরুষদের জীবন ও কর্ম আমাদের কাছে বিশেষ আলোচনার দাবী রাখে।

'পীর-ফকির' শব্দ বন্ধটির মধ্যে রয়েছে আলাদা দুটি শব্দ। পীর ও ফকির। ব্যুৎপত্তিগত ভাবে শব্দ দুটির আলাদা অস্তিত্ব রয়েছে। অর্থগত দিক দিয়েও শব্দ দুটি স্বাতন্ত্র্যে উদ্ভাসিত। বিদেশি ভাষা ফার্সি থেকে 'পীর' ও আরবি ভাষা থেকে 'ফকির' শব্দের আমদানি হয়েছে। তাই আদি উৎস থেকেই এর তাৎপর্য জেনে নিতে হবে।

'পীর' শব্দের অভিধানিক অর্থ হল বৃদ্ধ বা প্রাচীন এবং ভাবার্থগত অর্থ হল আধ্যাত্মিক গুরু। মানুষ যেসব শিক্ষকের কাছ থেকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা গ্রহণ করে তাঁদেরকে বুঝাতেই এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পীর শব্দটির অর্থ প্রসঙ্গে আরো জানা যায়- "পীর শব্দটির আভিধানিক অর্থ মুসলিম দীক্ষাগুরু, মুসলমান সাধু, মুসলমানদের মধ্যে ঈশ্বরজনিত পুরুষ, মহাপুরুষ, পূণ্যাত্মা প্রভৃতি।"[১] 'এনসাইক্লোপিডিয়া অব রেলিজিয়ন অ্যাণ্ড এথিক্স' গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে- "পীর শব্দটি ইসলামের সুফি বা অতীন্দ্রিয়বাদীদের মধ্যে আধ্যাত্মিক নির্দেশ বা পথ প্রদর্শককে বুঝায়। এ উপাধিধারী ব্যক্তি শেখ, মুর্শিদ, উস্তাদ নামেও পরিচিত।" পীরগণ যে নামেই পরিচিত হোন না কেন জনমানসে এঁদের প্রভাব অতুলনীয়। সাধারণ মানুষের কাছে এঁরা হলেন স্বর্গের পথ প্রদর্শক। ইরান, পারস্য, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে পীরগণ ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচিত হয়ে আছেন। কোনো না কোনো ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিকে পীরপদে বরণ করে নেওয়া একটা আবশ্যিক কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। লোকবিশ্বাসে পীরগণের প্রভাব সম্পর্কে ডক্টর মহম্মদ এনামুল হকের বিবরণ খুবই প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছেন—"পারস্য হইতে আরম্ভ করিয়া বিশাল প্রাচ্য ভূখণ্ডের সর্ব্বত্রই, 'পীরকে' ঈশ্বরিক শক্তিপ্রাপ্ত মরণশীল অথচ মরণাতীত অলৌকিক পুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করা হয়। কোন না কোন 'পীরের' নিকট হইতে দীক্ষা না লইয়া হঠাৎ মরিয়া গেলে, মৃত ব্যক্তিটির অভাবিত দূরদৃষ্টে এবং তজ্জন্য অনন্ত নিবয়-ভোগের সমূহ আশঙ্কায় শতকরা নব্বই জনেরও অধিক মুসলমান বিশ্বাসপরায়ণ। 'পীর' তাঁহার 'মুরীদ' বা শিষ্যের সহিত অনন্ত জ্যোতির্ম্ময় 'আল্লাহতালার' সাক্ষাৎকার ও মিলন ঘটাইয়া দিতে পারেন। যদি সাধারণ মানুষের ন্যায় রোগ ও ব্যাধীগ্রস্থ হইয়া 'পীর'গণ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করেন, তথাপি তাঁহাদের ভক্তেরা মনে করে, তিনি কেবল জরা-ব্যাধি কবলিত শরীর ত্যাগ করিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে অদৃশ্য জীবিত আছেন, তিনি মানব হইয়াও মানবোচিত সীমারেখা হইতে বহুদূরে বাস করেন, মৃত্যুর পরেও সূক্ষ্ম দেহে সর্বত্র বেড়ান, জীবিত ভক্তদের জন্য মঙ্গল কামনা ও অভিলাষ-সিদ্ধির জন্য প্রার্থনা করিতে পারেন ও করেন...। পীর সাহেবরা ভূত-বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের গতি নির্দেশ করিতে বা ফিরাইয়া দিতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে, আরবের শাস্ত্রীয় ইসলামের সর্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, দয়ালু, দাতা, সর্ব্ববিরাজমান আল্লার জ্ঞান, শক্তি, দয়া ও বিদ্যমানতা ইত্যাদি সর্ব্বাংশ না হউক অন্ততঃ কতকাংশ 'পীর'গণ অধিকার করিয়া বসিয়াছেন।"[২]

ডক্টর এনামুল হকের সুদীর্ঘ এই বক্তব্য থেকে পীরগণের প্রভাব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাবে জানা যায়। পীর শব্দের সমার্থক আরো দুটি শব্দ রয়েছে- সুফি ও মুর্শিদ। সুফি সাধকেরাই আমাদের এতদঞ্চলে 'পীর' নামে সমধিক পরিচিতি অর্জন করেছেন। 'সুফি' শব্দটি আরবি 'সুফা' ধাতু থেকে নিস্পন্ন, এর অর্থ হল পবিত্রতা। এই সুফি শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে আরো অনেক মতবাদ রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল গ্রিক 'ফিলোসফস্' শব্দের আরবি অপভ্রংশ 'ফয়সসূফ' অর্থাৎ দার্শনিক শব্দ থেকে সুফি শব্দের উদ্ভব। অন্য আরেকটি মত হল গ্রিক 'সফিসমা' অর্থাৎ জ্ঞান শব্দের আরবি অপভ্রংশ 'সফসত্বি' অর্থাৎ 'ভ্রান্তকূটতার্কিক' থেকে সুফি শব্দের উৎপত্তি। বেশিরভাগ আরবি পণ্ডিতের মতে আরবি স্বূফ অর্থাৎ পশম শব্দ থেকে 'সুফি' শব্দের উদ্ভব। সুফি শব্দের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে- "সুফি হলেন সে ব্যক্তি যিনি সকল সমস্যা ও খারাপ কাজ হতে পবিত্র থাকেন, তাঁর চিন্তা-ভাবনা ফিকর! দ্বারা পরিপূর্ণ এবং স্বীয় জীবনকে ঐশী সত্তার নিকট উৎসর্গ করেছেন। ফলে স্বর্ণখণ্ড বা কাদামাটি দুটোই তাঁর নিকট সমরূপে বলে বিবেচিত হয়। অর্থাৎ বলা চলে, যার সব ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা প্রভূর মাধ্যমে পরিচালিত হয়।"[৩]

'সুফি'গণ কর্তৃক আচরিত ধর্ম-কর্মের ধারাকে সুফিবাদ বলা হয়ে থাকে। এই 'সুফিবাদ' হল শরিয়ত পন্থী ইসলাম থেকে স্বতন্ত্র একটি ধারা। এটি হল ইসলামের মরমিয়া রূপ। এ প্রসঙ্গে মাটিন লিং এর মন্তব্যটি প্রাসঙ্গিক। তিনি বলেছেন— "Sufism or Tasawwuf as it is know in the Mauslim world, is Islamic

mysticism"[৪] সুফিবাদকে তাসাউওফ বোলএ অনেকেই উল্লেখ করেন। এর অর্থ হল সত্য বস্তুসমূহকে উপলব্ধি। আর মানুষের কাছে যা কিছু। রয়েছে তা ত্যাগের মধ্যে দিয়েই এই উপলব্ধি। আর মানুষের কাছে যা কিছু। রয়েছে তা ত্যাগের মধ্যে দিয়েই এই উপলব্ধির সূত্রপাত ঘটে। সোজা কথায় বলা যায় বিষয় নিস্পৃহতার উপরই তাসাউওফ এর তত্ত্বজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। এ বিষয়টার প্রতি লক্ষ্য রেখেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা 'সুফিবাদ' বা 'তাসাউওফ' কে 'মিস্টিসিজম' বা 'মরমিয়াবাদ' বোলএ নির্দেশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে 'বাংলা পীর সাহিত্যের কথা' গ্রন্থে গিরিন্দ্রনাথ বসু John A. Subhan এর কিছু মন্তব্য উদ্বৃত করেছেন। উদ্বৃতিটি এরকম "Sufism is that mode of religious life in Islam in which the emphasis is placed not so much on the performances of external ritual as on the activities of the inner self in other words it signifies Islamic Mysticism …This term has been popularized by western writers, but the one in common use among muslims in 'Tasawwuf' which its coughte 'sufi' is used for the mystic"[৪]

'সুফিবাদের' উদ্ভব প্রসঙ্গে জানা যায়, ইসলাম ধর্মের প্রচারক হজরত মুহাম্মদ থেকেই নাকি এর সূত্রপাত। হজরত মুহাম্মদ জটিল ও দুর্বোধ্য শিক্ষাসমূহ মৌখিকভাবেই তাঁর সাহাবাগণের নিকট বর্ণনা করতেন, যাতে সাহাবাগণ সহজে আল্লাহর কৃপা ও অনুগ্রহ লাভ করে মুক্তি লাভ করতে পারেন। হজরত মুহাম্মদের পর তাঁর চাচাতো ভাই তথা জামাতা হজরত আলী এই কাজের দায়িত্বভাব গ্রহণ করেন। এরপর বংশ পরম্পরায় বিভিন্ন প্রকার পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে তা বর্তমান অবস্থার রূপ লাভ করেছে। প্রকৃত অর্থে সুফিবাদের সূত্রপাত হয়েছিল খোলাফায়ে রাশেদিন এর পর উমাইয়া রাজবংশের দ্বারা ইসলামি শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়েছিল। এই রাজবংশের খলিফাগণ পার্থিব ভোগবিলাসের প্রতি অত্যাধিক আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। ফলে ইসলামের একনিষ্ঠ অনুসারীবৃন্দ তাদের প্রতি সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরা জাগতিক মোহ কাটিয়ে স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্কোন্নউওনের প্রচেষ্টা চালাতে শুরু করেছিলেন। ইসলামি শরিয়ত এর কাছে অনুগত থেকেও আত্মিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট কিছু ধারণা ও প্রথার সূচনা করলেন তাঁরা। এরমধ্যে অন্যতম কয়েকটা হল - দৈহিক কৃচ্ছতা সাধন, স্বীয় দারিদ্র্যভাব ও সকল প্রকার খারাপ কাজ বর্জন, সারারাত নামাজ ও অন্যান্য প্রকার ইবাদতে লিপ্ত থাকা। এছাড়া তাঁরা সর্বদা ক্রন্দনরত অবস্থায় থাকতেন এবং এ পৃথিবীকে দুঃখের স্থান বলে বিবেচনা করে সবসময় আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকতে শুরু করেন। কিয়ামতের দিবসকে বেশি করে স্মরণ করা, কম কথা বলা, স্বল্প পরিমাণে আহার করা, নিদ্রাহীন থাকা প্রভৃতি অভ্যাসের অত্যাধিক চর্চা শুরু করেছিলেন। এ সব প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই তাঁরা আল্লাহকে লাভ করার প্রয়াস করেছিলেন। প্রয়াসকারী ওই সব পুরুষেরা সুফি বলে বিবেচিত হয়ে আসছেন। প্রাথমিক পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য কয়েকজন সুফিসাধক হলেন—হাসান বসরি, জননুন মিশ্রী বায়েজিদ বোস্তামি, জুনাইদ বাগাদাদি, মনসুর হাল্লাজ প্রমুখ। পরবর্তীকালে ইরাকের রাবেয়া বসরি, মিশরের আহমদ আল বাদাত্তী, বাগদাদের বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী, আজমিরের খাজা মইনুদ্দীন মোহাম্মদ হাসান চিশতী, বুখারার মুহাম্মদ বাহা উদ্দিন নকশবন্দী, ইরানের শাহওয়ালী নিয়মতুল্লাহ, মরক্কোর ফরিদ উদ্দিন শেখ আহমদ আত তিজানি, তুরস্কের জালাল উদ্দীন রুমী, ইরাকের আবু হাফস উমর আল সুহারাওয়াদি প্রমুখ সাধকগণের মাধ্যমে সুফি ধারা গোঠা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করে। সুফিগণের এই ধারাকে 'সুফিবাদ' বলে চিহ্নিত করা হয়।

সুফিবাদ মূল চারটি উপাদানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই উপাদানগুলো হল শরিয়াত, তরিকাত, হাকিকাত ও মারিফাত। শরিয়াত বলতে ইসলামি বিধি-বিধানকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসরণ করাকে বুঝায়। তরিকাত হল ইসলামি আধ্যাত্মবাদ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা এবং কোনো না কোনো একজন পীরকে দীক্ষাগুরু হিসাবে বরণ করা। তরিকাতের জ্ঞান লাভ করার পর পরিপূর্ণ ভাবে তা অনুধাবন করতে পারাই হল হাকিকাত। আর সর্বশেষ পর্যায়ে আল্লাহ ও প্রকৃত সত্য সম্পর্কে উপলব্ধি করতে পারাটাই হল মারিফাত।

সুফি সাধকগণের সাধন প্রক্রিয়ার মধ্যে সুক্ষ্ম কিছু তারতম্য লক্ষিত হয়। একারণেই এক একজন বড় মাপের সুফি সাধককে কেন্দ্র করে এক একটা তরিকা গড়ে উঠেছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল- আহমাদিয়া তরিকা, কাদিরিয়া তরিকা, চিশতীয়া তরিকা, নকশবন্দিয়া তরিকা, সুহরাওয়াদিয়া তরিকা প্রভৃতি।

এই সুফি সাধকেরাই সর্বত্র পীর উপাধিতে ভূষিত হয়ে আছেন। 'সুফি সাধক' ছাড়া অন্য কেউ 'পীর' বলে স্বীকৃতি লাভ করেছেন এমন কোনো তথ্য আমরা খোঁজে পাইনি। 'পীর'গণকে মুর্শিদ বলেও সম্বোধন করা হয়। এই মুর্শিদ শব্দের অর্থও হল পথ প্রদর্শক। পথ প্রদর্শক বলতে নিশ্চয়ই আল্লাহের সঙ্গে সান্নিধ্য লাভের পথ নিরূপণকারীর কথা বোঝানো হচ্ছে। মুর্শিদ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট লেখক বিমল কর এর মন্তব্য উপস্থাপন করছি। তিনি লিখেছেন— "যিনি কোন বিখ্যাত সমর বিদ্যালয়ে (তরিকাত মাদ্রাসা) অধ্যায়ন করিয়া অর্থাৎ নফসে আম্মারার সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া উহাকে যুদ্ধে নিহত করিয়া উহার অস্ত্র শস্ত্র লুণ্ঠন পূর্বক জয়লাভ করিয়া তথাকার মুরশিদ হইতে উপযুক্ত সার্টিফিকেট মঞ্জুর করিয়া নিয়া আসিয়াছেন এবং যাহার যুদ্ধ প্রণালী সম্পর্কে খুব ভালভাবে জ্ঞান আছে, এমন একজন দক্ষ সেনাপতির নামই হল মুরশিদ।"[৫]

মুর্শিদের গুণাবলী তথা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরো বিশদ আলোচনায় নিম্নরূপ ভাবে জানা যায়—

(ক) যিনি কোনো কামিল উস্তাদের খেদমতে বহুকাল থেকে নূরে মহাম্মদী বা বেলায়ত হাসিল করে সনদ লাভ করেছেন তিনিই হলেন মুর্শিদের উপযুক্ত।

(খ) মুর্শিদগণের মধ্যে জাহিরা ইল্‌ম (বাহ্যিক জ্ঞান) ও বাতিন ইল্‌ম (আধ্যাত্মিক জ্ঞান) উভয়ই থাকে।

(গ) মুর্শিদগণ শরিফ খান্দাদনের (উচ্চ বংশের) হয়ে থাকেন।

(ঘ) মুর্শিদ হওয়ার ক্ষেত্রে কোরানে হাফিজ বা মৌলানা হতে না পারলেও আরবি, ফার্সি, উর্দু, মাতৃভাষা প্রভৃতিতে জ্ঞান থাকতে হবে।

(ঙ) পীর বা মুর্শিদের উপযুক্ত তিনিই যিনি চার এমামের কোনো না কোনো একজনকে অনুসরণ করে সর্বদা খোদার প্রেমে থাকেন এবং আল্লা ও রসুলের আলোচনা ছাড়া অন্য কোনো প্রকার আলোচনায় কালাতিপাত করেন না।

(চ) শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত, মারিফত চারটি স্তরই মুর্শিদগণের আয়ত্বাধীন থাকে।

(ছ) তাঁদের মধ্যে দুনিয়ার প্রতি কোনো মহব্বত থাকে না। ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা দ্বারা অলংকৃত হয়ে থাকে মুর্শিদগণের চরিত্র। তাঁরা ধীর, স্থির, সরল, গম্ভীর, স্বল্পভাষী এবং নির্জনে থাকতে পছন্দ করেন।

(জ) দরবেশ বা মুর্শিদ হতে পারেন ওই ব্যক্তি যিনি দুনিয়ার প্রতি কোনো মহব্বত রাখেন না এবং আখেরাতের প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করেন না।

পীর, সুফি, মুর্শিদ এর সমার্থক বা সমকক্ষ হিসাবে আরেকটি শব্দের প্রচলন রয়েছে সেটি হল 'দরবেশ'। এটি ফার্সি শব্দ। এর মধ্যে থাকা 'দর' শব্দের অর্থ হল দরজা। দরবেশ শব্দের পরিচয় প্রসঙ্গে ড. আলা উদ্দিন মণ্ডল বলেছেন— "ধর্মীয় জীবন যাপনের জন্য যে ব্যক্তি দোরে দোরে ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা নিয়ে বেঁচে থাকেন তিনিই দরবেশ।"[৬] আমরা সাধারণত দেওরবেশ বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝে থাকি, যিনি খুব কম কথা বলেন, সবসময় নিজের মধ্যেই নিজে নিমগ্ন থাকেন, জাগতিক ব্যাপারে ঔৎসুক্য দেখান না, এমনকি খাওয়া-পরা-নিদ্রা প্রভৃতির প্রতিও উদাসীন ভাব প্রকাশ করে থাকেন। তাঁদেরকে দেখলেই মনে হয় কোনো এক অনির্বচনীয় ভাবের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে আছেন। সাধারণ মানুষ এঁদেরকে ভয়-মিশ্রিত শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকেন। অনেকেই এই ধরনের মানুষকে আউলিয়া বলেও সম্বোধন করেন।

'ফকির' শব্দটির অতি সাধারণ অর্থ হল ভিক্ষুক। যারা মানুষের দরজায় দরজায় ঘুরে ভিক্ষা করে বেড়ায় তাদেরকে ফকির বলে চিহ্নিত করা হয়। তবে তাত্ত্বিক পরিভাষায় 'ফকির' শব্দের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। বিশিষ্ট গবেষক সুধীর চক্রবর্তী বলেছেন- "শারিয়ত-সন্ধিহান মুসলমানরা যখন মারফতি পথ বেঁচে নেয় তখন তাদের ফকির বলে।"[৮] এই ফকির শব্দের সঙ্গে ফার্সি দরবেশ ও বাংলা 'বাউল' শব্দের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। বিশেষত বাউল ও ফকির শব্দ দুটো সমগোত্রীয়। বাউলেরা হলেন কিছুটা হিন্দুধর্ম ঘেষা আর ফকিরেরা হলেন ইসলাম ধর্ম ঘেষা। তবে উভয়ের মধ্যে শাস্ত্রীয় তথা শরিয়তের চেয়ে ধর্মের লৌকিক রূপটাই প্রবল। এ ব্যাপারটা সুধীর চক্রবর্তীর আরেকটি বয়ানে পরিস্কার ভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি বলেছেন— "ফকির পন্থার মানুষজন বা মুসলমান বুলরা (এইসব) ইসলামি নির্দেশ ও আকীদায় যথাযথ আস্থাশীল নন বরং ঘোরতর সংশয়ী। তাঁরা প্রধানত মরমিয়াবাদী (mystic) ও বিচারশীল। শুধু কোরাণ বা হাদীস নয়, বেদ বা পুরাণ এমনকি প্রকৃতপক্ষে যে কোনো শাস্ত্রেরই তাঁরা বিরোধী। কেননা তাঁদের মতে শাস্ত্র মনুষ্যরচিত অর্থাৎ খণ্ডিত সত্যের বাহক।"[৯] গান হল ফকিরগণের নিত্যসঙ্গী। গানের মধ্যে দিয়েই তাঁরা নিজ নিজ ভাবনা ও আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করে তুলেন। গানই হল তাঁদের সাধনার মূল অবলম্বন। প্রচণ্ড দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও জাগতিক লোভ-লালসা, আরাম-আয়েশ, মান-সম্মান সবকিছুই বিসর্জন দিয়ে তাঁরা 'মনের মানুষের' সন্ধানে বেঘোর হয়ে ঘুরে বেড়ান।

আত্মানুসন্ধানই ফকিরগণের একমাত্র কর্ম এবং নিজেদের অস্তিত্বে অর্থাৎ দেহে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে পারাই তাঁদের সাধনা। অনুভূতি এবং অর্ন্তমনের অভিজ্ঞতা তাঁদের পথ নির্দেশ করে। ফকিরদের সাধনার প্রক্রিয়াটা বড় কঠিন। প্রচলিত ধর্মাচার বর্জন করা থেকেই কাঠিন্যের সূত্রপাত হয়। জপ-তপ, উপবাস, তীর্থভ্রমণ, মসজিদ-মোল্লা প্রভৃতি সহ সবধরনের শাস্ত্রীয় নির্দেশ তাদের কাছে বর্জনীয়। তাঁদের পোষাক-পরিচ্ছদ, বেশ-ভূষা প্রভৃতিও নবির নির্দেশ বহির্ভূত। ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ন্যায় তারা গোফ বিহীন দাড়ি রাখেন না; চুল ও ছোট করে কাটেন না। তাঁরা দাড়ি-গোফ-চুল সবকিছুই লম্বা করে ফেলেন আর নতুবা ন্যাড়া মাথায় লম্বা গোফ-দাঁড়ি রক্ষা করেন। তাঁরা আত্মবোধে সমৃদ্ধ বলেই বোধ হয় বাহ্য ব্যাপারে এত অনাগ্রহী।

ইসলামি ফকির সম্প্রদায়ের উৎপত্তি কোরাণ, হাদিস ও নবি-সাহাবা গণের জীবনাদর্শ থেকেই। ফকিরি তরিকার সিজরানামায় কোনো অমুসলিম মুরশিদ বা সাধকের নাম কিংবা পরিচয় পাওয়া যায় না। বাংলার বাইরে থেকে আগত উচ্চাঙ্গের তত্ত্ব ও দৃষ্টিসম্পন্ন সাধক পুরুষগণ মুসলমান সুফি, দরবেশ, আউলিয়াদের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে এখানকার ফকির সম্প্রদায়ের জন্ম দিয়েছেন।

ফকিরেরাও তাঁদের সিলসিলার আদি পুরুষ হিসাবে হজরত মুহাম্মদকে চিহ্নিত করে থাকেন। নবিগণের মধ্যে থাকে নবুয়ত ও বেলায়ত। নবুয়ত হল ঈশ্বরের কাছ থেকে সরাসরি ভাবে প্রাপ্ত জ্ঞান বা 'ওহি' আর বেলায়ত হল হৃদয়জাত জ্ঞান, গুরুর সিনা (হৃদয়) থেকে শিষ্যের সিনায় চলে যায়। ফকিরেরা এই বেলায়ত জ্ঞানকেই মান্য করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে মোঃ সোলোয়মান আলী সরকার মন্তব্য করেছেন—"বাংলার ফকির দরবেশরা তাঁদের আধ্যাত্মিক সাধনার গুরু-শিষ্য পরম্পরার মাধ্যমে শেষ নবীতে গিয়ে পৌঁছান এবং তাঁকে সুফি সিলসিলার সর্বপ্রথম ব্যক্তি হিসাবে স্বীকার করেন।"[১০]

ফকিরেরা আরবি ভাষার ৩০টি হরফ কোরাণের মধ্যে কী অর্থ, সংকেত ও প্রতীক বয়ে এনেছে এবং রূপক ও সংকেতের আড়ালে গুপ্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার কীভাবে নির্মিত হয়েছে, তার জাগতিক ও পরমার্থিক অনুষঙ্গে বহুমাত্রিক ব্যাখ্যা হাজির করেন। এই গুপ্তজ্ঞান গুরু-শিষ্য তথা মুর্শিদ ও মুরিদ পরম্পরায় বিস্তার লাভ করে।

'ফকির' এর সমগোত্রীয় আরেকদল সাধক আছেন, এঁদেরকে 'বাউল' বলা হয়। 'বাউল' শব্দের অর্থ নিয়ে ব্যাপক মতবিরোধ রয়েছে। অনেকেই মনে করেন এই শব্দটি এসেছে প্রাকৃত 'বাউর' শব্দ থেকে। তাঁদের মতে বাংলার বাউলদের ন্যায় একদল বিশৃঙ্খল চিন্তাজীবী লোক উত্তর ভারতেও দেখা যায় আর আমাদের বাউলেরা

তাঁদেরই গোষ্ঠীভুক্ত। ফলে 'বাউর' শব্দের 'র' বাংলা উচ্চারণে 'ল' হয়ে গেছে। প্রাকৃত বাউল শব্দের অর্থ হল এলোমেলো, বিশৃঙ্খল, পাগল। অন্য আরেক পক্ষ মনে করেন বাউল শব্দটি এসেছে বাংলা আউল > সং আকুল শব্দ থেকে। এঁদের মতে যে সকল লোক আউল অর্থাৎ আকুলভাবে সমাজ ও সভ্যতার ধার না ধেরে উন্মানার ন্যায় ঘুরে বেড়ায়, তারাই বাউল। বাউল হল আউল শব্দের পৌনঃপুনিক অপভ্রংশ, যেমন আউল > আউল-বাউল > বাউল। আবার কারো কারো মতে বাউল শব্দটি সংস্কৃত 'বায়ু' শব্দের বাংলা রূপান্তর 'বাউ' এর সঙ্গে 'ল' প্রত্যয় যোগে উৎপন্ন হয়েছে। এঁরা মনে করেন যেসব লোক 'বায়ু' অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার সাধনার দ্বারা আত্মিক শক্তি লাভ করবার চেষ্টা করে অথবা 'বায়ু' রোগগ্রস্থ ও উন্মাদ তাঁরাই বাউল। 'বাউল' শব্দের উৎপত্তি সম্পর্কে সবচেয়ে জনপ্রিয় মতবাদ হল সংস্কৃত 'বাতুল' শব্দ থেকে বাংলা বাউল শব্দের উদ্ভব। প্রাকৃত ব্যাকরণ মতে দুটি স্বরবর্ণের মধ্যবর্তী ব্যঞ্জনবর্ণ লোপ পায়। এই সূত্রানুযায়ী 'বাতুল' শব্দের মধ্যে থাকা 'আ' এবং 'উ' স্বরবর্ণের মধ্যবর্তী 'ত' ব্যঞ্জনবর্ণ লোপ পেয়ে বাতুল থেকে বাউল হয়েছে। এই মতবাদ অনুযায়ী যে সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রকৃত অর্থেই পাগল এবং কোনো সামাজিক বা ধর্মসম্বন্ধীয় বিধিনিষেধ মানে না, তাঁরাই বাউল।

বাউলের পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-আচরণ, ধর্ম-কর্ম, চলা-ফেরা সবকিছুই স্বাতন্ত্র্যে ভরা। সাধারণ জীবন-যাপনের সঙ্গে এঁদের খাপ-খাওয়ানো যায় না। কোনো একটা নির্দিষ্ট ধর্মীয় গণ্ডির মধ্যে এঁদেরকে আবদ্ধ করা যায় না। রেবতীমোহন সরকার বাউলের জীবনধারা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন- "বাউল জীবনাদর্শ হল মানবপ্রেমের এক অভিনব এবং সার্থক প্রচেষ্টা। বাউলের জীবনধারা, তার পোষাক-পরিচ্ছেদ, গানের কথা ও সুর, আচার-প্রণালী এবং তাদের আধ্যাত্মবাদ ও দর্শন সবই অদ্ভুত- এগুলির প্রতিটির মধ্যে রয়েছে নিজস্বতা একটি বিশিষ্ট চিন্তাধারার প্রকাশ।"[১১]

বাউলেরা কোনো প্রথাগত ধর্ম ও সামাজিকতা মানেন না। জাতি ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সব মানুষকে ভালোবাসাই তাঁদের ধর্ম। তাঁদের বিশ্বাস ঈশ্বর-আল্লা কোনো মন্দির, মসজিদে বা গির্জায় বাস করেন না। তাঁর বাস মানুষের হৃদয় মন্দিরে। এ ব্যাপারটা প্রতিফলিত হয়ে ওঠে বাউলের গানে, আদর্শে ও চিন্তাধারায়। তাঁরা মনে করে মানুষকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসতে পারলেই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা যায়। বাউলের বিশ্বাস মতে যেহেতু মানুষের হৃদয়মন্দিরেই ঈশ্বরের অবস্থান, তাই তাঁরা সাধনক্ষেত্র হিসাবে মানুষের দেহকেই আঁকড়ে ধরেছেন। বাউলের মূলমন্ত্র হল 'যা আছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তাই আছে দেহভাণ্ডে।' অতএব দেহভাণ্ডকে চিনতে পারাই বাউলের প্রধান সাধনা। বাউলেরা হলেন বাংলার একান্ত নিজস্ব সম্পদ। অন্যত্র এঁদের দেখা মেলে না। আর দেখা মিললেও তাঁরা সেখানে অন্য নামে পরিচিত।

বাউলের প্রায় সম পর্যায়ের আরো দুটি সাধক সম্প্রদায় রয়েছে। সেদুটি হল বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ সহজিয়া। বাউলের মধ্যে ওই দুটি সম্প্রদায়ের অর্ন্তলীন সম্পর্ক খোঁজে পাওয়া যায়। সাধারণভাবে হাটে-বাজারে, মাঠে-মজলিশে যারা গান গায় তাদেরকে অনেকেই বাউল বলে সম্বোধন করে থাকেন। তবে এই প্রকার সম্বোধন সাধারণীকরণ দোষে দুষ্ট।। বাউল হতে হলে কেবল গান করলেই হয় না, গানের মধ্যে দিয়ে সাধনা করতে হয়। আর সে সাধনা হতে হয় পরমাত্মাকে জানার ও বোঝার সাধনা।

পীর-ফকির বিষয়ক আলোচনায় আমরা পীর ও ফকির সহ আরো কতকগুলো শব্দ তথা সম্প্রদায় সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করেছি। পীর ফকির, দরবেশ, আউলিয়া, বাউল এঁরা সবাই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সুফি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত। সুফিগণ আমাদের ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলাদেশে আগমনের পূর্বে পীর-ফকির সহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের কোন অস্তিত্ব লক্ষিত হয় না। এবারে আমাদের বাংলা ভূমিতে সুফিগণের আগমন প্রসঙ্গে সামান্য আলোকপাত করছি।

খ্রিস্টীয় অষ্টম-নবম শতক থেকেই আমাদের দেশে মুসলমানদের আগমন শুরু হয়ে গিয়েছিল বলে কিছু তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলাদেশের রাজসাহি জেলার পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসস্তূপ থেকে খলিফা হারুন-উর রশিদ এর রাজত্বকালের সময়কার একটি মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়ে মুসলমানদের আগমনের দিকনির্দেশনা করছে। আরবেরা বণিকের জাত। তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি। দশম শতকের মাঝামাঝি সময়ে সমুদ্র বন্দর তথা বাণিজ্য কেন্দ্র চট্টগ্রামে আরবি বণিকদের ব্যাপক আগমন ঘটেছিল। তাদের সঙ্গে করে নিয়ে আসা ধর্ম ইসলাম সে সময় থেকেই বিস্তৃতি লাভ করতে শুরু করে। ঐসব আরবি বণিকদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন নিষ্ঠাবান মুসলমান। তারা ব্যবসায়িক দিকের চেয়ে ধর্ম-কর্মের প্রতি বেশি মনোনিবেশ করতেন। স্থানীয় লোক তাদের আচার-আচরণ দেখে ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজি রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাস্ত করে বঙ্গ অধিকার করেন। মুসলমানরা রাজশক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। এরপর থেকে বিপুল সংখ্যায় মুসলমানদের আগমন ঘটতে থাকে। অনেকে যেমন রাজকর্মচারী হিসাবে এসেছিলেন, তেমনি আবার অনেকেই কেবলমাত্র ইসলাম ধর্ম প্রচার করতেই এসেছিলেন। এঁরা পূর্ব থেকেই ধর্ম প্রচার ও ঈশ্বর সাধনার কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করে রেখেছিলেন। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে আগত নিস্পৃহ, নিরাসক্ত পুত-পবিত্র ওই মানুষদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এদেশের মানুষ দলে দলে ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। এই ব্যাপারটার পিছনে আরো অনেক কারণও বিদ্যমান ছিল। এর মধ্যে অন্যতম, একটি হল বর্ণাশ্রম প্রথা। বর্ণাশ্রম প্রথা হিন্দুধর্মের তথাকথিত নিম্নবর্ণের লোকদের জীবন অতিষ্ট করে রেখেছিল। ওইসব লোক ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করে মুক্তির সাধ লাভ করেছিল। এজন্য বলা হয়ে থাকে – ভারতবর্ষের মুসলমানরা নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায় থেকে সৃষ্ট। একথাটা পুরোপুরি অসত্য নয়। মুসলমান পীর-ফকির-দরবেশ কর্তৃক যখন এদেশে ইসলাম ধর্মের প্রচার-প্রসার-বিস্তার হতে লাগল তখন এখানকার সমাজ জীবনেও পরিবর্তন সূচিত হতে থাকল। তাঁরা ইসলাম ধর্মের প্রচারের মধ্যে দিয়ে পরোক্ষভাবে হিন্দুধর্মেরও সংস্কার সাধন করে তুলতেন। পীর-ফকিরগণের প্রভাবে অসংখ্য লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করায় হিন্দু ধর্মের কাণ্ডারীরা আবার নতুন করে ভাবতে বাধ্য হলেন। জাতিভেদ প্রথা কিছুটা হ্রাস করা হল, আর্য ব্রাহ্মণেরা অনার্যের দেব-দেবী ও ধর্ম-কর্মকে মান্যতা দিলেন। ফলে হিন্দু ধর্মও নবরূপে-নবশক্তিতে আত্মপ্রকাশ করল।

বহিরাগত পীর-ফকির-দরবেশ-বাউল প্রমুখ মানুষজন এদেশে এসে এখানকার সবকিছু সঙ্গে একাত্মা হয়ে গিয়েছিলেন। স্থানীয় লোকেরা যেমন তাঁদেরকে বিদেশি বলে দূরে সরিয়ে রাখে নি। গিরিন্দ্র নাথ বসুর জবানিতে- "তাঁরা এদেশের ভাষাকে আয়ত্ত করেছিলেন, এদেশের ভাবজগতের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন- প্রাকৃতিক অবস্থাকে মেনে নিয়েছিলেন- নির্যাতিত সাধারণ মানুষের দুঃখের ভাগ নিয়ে সামগ্রিকভাবে মানবীয় কল্যাণকর পরিস্থিতির সঙ্গে মিতালি করেছিলেন। অপর পক্ষে তাঁরা মানুষের প্রতি সামাজিকভাবে অন্যায়-অত্যাচার, ব্যক্তি-স্বার্থগত শাসন-শোষণ প্রতিরোধের জন্য জীবনপণ সংগ্রাম করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত এদেশের আত্মার সঙ্গে নিজেদেরকে একাত্ম করে নিয়েছিলেন।"[১২]

ইসলাম ধর্মের দুটি ধারা রয়েছে একটি শরিয়ত ও অপরটি মারিফত। শরিয়ত হল কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন, কর্তব্য-কর্ম ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে ধর্মীয় জীবনযাপন করা। শরিয়তের বিধি-বিধান সমূহ কেতাব-কোরান দ্বারা স্বীকৃত ও পূর্বনির্ধারিত। আর মারিফত হল গুরু পরম্পরায় আহরিত ধর্মীয় জ্ঞান। এতে কোনো সুনির্দিষ্ট ও সর্বজনীন কর্তব্যকর্ম নেই। বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তাই মারিফত পন্থী পীর-ফকিরদের সংস্পর্শে এসে ধর্মান্তরিত মানুষদের তেমন কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় নি। বরঞ্চ তাদের পূর্বেকার আচার-আচরণ বেশ কিছুটা রক্ষা করতে পেরেছিলেন। এর থেকেই মুসলমান সমাজে-হিন্দু সংস্কৃতির কিছুটা প্রবেশ ঘটেছিল। পীর-ফকিরদের দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করা, দরগায় গিয়ে বাতি জ্বালানো-মানত পালন করা, বিয়ের অনুষ্ঠানে বাজি-পটকা পোড়ানো প্রভৃতি বেশ কিছু আচার-অনুষ্ঠানের আমদানি হয়েছে হিন্দু সমাজ থেকে। শুধু তাই

নয় নবাগত মুসলমানেরা তাদের আরাধ্য দেব-দেবীকেও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। মুসলমান সমাজে এসে এঁরা নবরূপ লাভ করেছিলেন। রামাই পণ্ডিত 'শূন্য পুরাণ' এ লিখেছেন—

"ব্রহ্মা হৈল্যা মহামদ বিষ্ণু হৈলা পেকাম্বর
আদম্ব হইলা শূলপানি।
গণেশ হইলা গাজী কার্ত্তিক হইলা কাজী
ফকির হইলা জথ মুনি।
আপনি চণ্ডিকা দেবী তিহঁ হইলা হায়াবিবি
পদ্মাবতী হইলা বিবি নূর।"[১৩]

এভাবেই মারিফত পন্থী পীর-ফকিরগণের পরোক্ষ সহযোগিতায় হিন্দু-মুসলমানের ধর্মীয় বিশ্বাসে সমন্বয় সূচিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ড. তৃপ্তি ব্রহ্মের বয়ান হল-- "আজন্ম ধর্মসংস্কার ও বিশ্বাসের কাছে হিন্দুর দেব-দেবীরা অবলীলা ক্রমে ও অতি সহজেই, গাজি/গণেশ, কাজি/কার্ত্তিক, বনবিবি/বনদুর্গা প্রভৃতি হয়ে গেছেন। বৌদ্ধ ধর্মের শেষ চিহ্ন ধর্মঠাকুরও এই স্রোতের মুখে পীর ঠাকুর হয়ে গেলেন।"[১৪]

পীর-ফকিরের জীবিত থাকাকালীন অবস্থায় তাঁদের খানকা যেরূপ মানুষের আশ্রয় স্থল হিসাবে থাকে, তাঁদের মৃত্যুর পরও সমাধিক্ষেত্র (দরগা/মাজার) পূণ্যার্থী মানুষের কাছে তীর্থভূমি হিসাবে বিবেচিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে আবার তাঁদের সমাধিক্ষেত্র খোঁজে পাওয়া যায় না। এতে পীর-ফকিরের সাময়িক বৈঠকখানাকেই পূণ্যস্থান হিসাবে বিবেচনা করে সেখানেই লোকসমাগম লেগে থাকে। লোক মানসের বিশ্বাস পীর-ফকিরগণ মৃত্যুর ওপার থেকেও ভক্ত হৃদয়ের আর্তি শুনতে পান আর তাঁরা ভক্তপ্রাণের মনস্কামনা পূরণ করে দিতে পারেন। পূণ্যভূমি বরাক উপত্যকায় পীর-ফকিরের অসংখ্য দরগা রয়েছে। কিছু কিছু জায়গা সমাধিক্ষেত্র না হয়েও পূণ্যভূমি হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। যেমন— ফুলেরতলের লঙ্গর শাহ বাবার মোকাম, ঘাড়মুরার প্যাঁচদ পীরের মোকাম। পীর-ফকিরগণের মৃত্যুর পর ভক্তবৃন্দ তাঁদের সমাধি স্থানের উপর সুরমা অট্টালিকা সদৃশ স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করে নেন। এগুলোই দরগা বা মোকাম হিসাবে বিবেচিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ করিমগঞ্জ মাইজডিহি এলাকার সৈয়দ আনোয়ার শাহ, বদরপুরের শাহ আদম খানি প্রমুখের সমাধিক্ষেত্রে কথা বলা যায়। আবার অনেক পীর-আউলিয়া আছেন যাঁদের সমাধিক্ষেত্র অতি সাধারণ ভাবে পড়ে রয়েছে। এঁরা আসলে চরমতমভাবে শরিয়ত পন্থী ছিলেন। তাঁরা সর্বশক্তিমান আল্লাহ ছাড়া আর কারো কিছু করার ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করতেন না। তাই মুরিদগণকে ঐরূপ শিক্ষাই দিয়ে গেছেন। এঁদের মতে সমাধিক্ষেত্রে গিয়ে বাতি জ্বালানো, মানত করা ধর্ম-কর্ম পালন করা পূজারই নামান্তর। এরূপ আচরণ তাঁদের কাছে বেদাত, অনঐশ্লামিক। শরিয়ত পন্থী এই ব্যক্তিবর্গ পীর হিসাবে দায়িত্বভার পালন করে গেলেও এঁরা কিন্তু মৌলবী, মৌলানা, আল্লামা ইত্যাদি বিশেষণেই ভূষিত হয়ে আছেন। এঁদের মধ্যেকার একজনের সমাধিক্ষেত্র বিদ্যমান রয়েছে বাঁশকান্দি মাদ্রাসার প্রাঙ্গনে। ঐ মাদ্রাসার প্রাণ পুরুষ মৌলানা আহমদ আলী সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁর কর্মক্ষেত্র তথা মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে তাঁকে সমাহিত করা হত। যদিও উনার হাজার হাজার শিষ্য ও ভক্ত মণ্ডলী রয়েছেন কিন্তু উনার সমাধিক্ষেত্র কেবলমাত্র বাঁশের বেড়া দিয়ে আগলে রাখা আছে। ঐ সমাধিক্ষেত্রে গিয়ে কোনো প্রকার আর্জি পেশ করা হয় না বরঞ্চ আল্লাহের কাছে মৃতের মুক্তি কামনা করা হয়।

পীর, ফকির শব্দ দুটির পরিধির মধ্যে আউল, বাউল, অলি, আউলিয়া, শেখ, মুর্শিদ, দরবেশ, সুফি, কুতুব প্রভৃতি ইসলাম পন্থী শব্দসমূহ তথা সাধকগণ একাত্মা হয়ে আছেন। সূক্ষ্ম বিচারে যদিও এঁদের প্রত্যেকের মধ্যে আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে, তবে বৃহৎ অর্থে এঁদেরকে একই শ্রেণিভুক্ত করে নেওয়া যায়। বরাক উপত্যকার পীর-ফকির বলে আমরা যাঁদেরকে চিহ্নিত করতে চাইছি তাঁদের মধ্যে এইসব বিভিন্ন ধারার সাধক রয়েছেন। তাই এঁদের প্রত্যেককে একসাথে বোঝাতে গিয়ে আমরা 'পীর-ফকির' শব্দবন্ধটি ব্যবহার করছি। আমাদের কাছে পীর ও ফকির আলাদা দুটি শব্দ নয়, একটি শব্দ-বন্ধ মাত্র।

তথ্যসূত্র :

১। রায় বিশ্বজিৎ, উত্তরবঙ্গের পীর ও পীর সাহিত্য, সোপান পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১২, পৃঃ ১৮।
২। হোক, ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল, বঙ্গে সফী প্রভাব, র‍্যামল পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৬, পৃঃ ১৪৪-১৪৫।
৩। উল্লাহ, ড. নজমুল আহসান বালিম, সুফি দর্শন ও তরিকা প্রসঙ্গ পাবলিশিং হাউস্, ঢাকা, ২০১৩, পৃঃ ১৬।
৪। Lings, Martin, What is Sufism? The Islamic Texts Society, 1999, P.-15.
৫। কর, বিমল, সুফি সাধক কবি রকীব শাহ (রঃ), নববীথি প্রকাশনী, ঢাকা, ১ম প্রকাশ ১৯৯৫, পৃঃ ২৫।
৬। মণ্ডল, আলাউদ্দিন, উপন্যাসে অন্যস্বর, নয়া উদ্যোক্তা, কলকাতা, ১ম প্রকাশ ২০১২, পৃঃ ৬৩।
৭। বসু, গিরিন্দ্রনাথ, বাংলা পীর সাহিত্যের কথা, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ২য় সংস্করণ ১৯৯৮, পৃঃ ১৫।
৮। চক্রবর্তী, সুধীর, বাউল ফকির কথা।
৯। চক্রবর্তী, সুধীর, ব্রাত্য লোকায়ত লালন, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২য় সংস্করণ ১৯৯৮, পৃঃ ১৯৬।
১০। সরকার, মোঃ সোলায়মান আলী, লালন শায়ের মরমী দর্শন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃঃ ২৬২।
১১। মিত্র, শ্রী সনৎ কুমার (সম্প), বাউল লালন রবীন্দ্রনাথ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৫, পৃঃ ৩৩।
১২। বসু, গিরিন্দ্রনাথ, তদেব, পৃঃ ১৮-১৯।
১৩। রহমান, সামসুর, বাঙালি মুসলমান সমাজ ও মাদ্রাসা শিক্ষার ইতিবৃত্ত, মল্লিক ব্রাদার্স, প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা, কলকাতা বইমেলা, ২০১৫, পৃঃ ৩৫।
১৪। ব্রহ্ম, ড. তৃপ্তি, লোক জীবনে বাংলার লৌকিক ধর্ম সঙ্গীত ও ধর্মীয় মেলা, পৃঃ ৫২।